



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 308 - 312

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘পরভৃতিকা’ উপন্যাসের নায়িকা কৃষ্ণা : স্বনির্ভরতা ও স্বচ্ছ চরিত্রবোধ

অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: saurenugb@gmail.com

ও

পায়েল কর্মকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: karmakarpayel975@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

পরভৃতিকা,
আত্মরক্ষা ও
আত্মমর্যাদা,
স্বনির্ভরতা এবং
স্বচ্ছতা।

Abstract

সীতা দেবীর ‘পরভৃতিকা’ উপন্যাসটি রচিত হয় এমন এক সময়ে, যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কন্যাসত্তানকে প্রায় অনাবশ্যিক আবর্জনার মতোই দেখা হত। জমিদার পরিবারে বংশরক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। এই মানসিকতারই নির্মম শিকার হয় কৃষ্ণা। যার বেড়ে ওঠার কথা ছিল রাজপ্রাসাদে, তাকে যেতে হয় অচেনা পথে। মিসেস মিত্রের তত্ত্বাবধানে গিরিডির উদ্রী নদীর ধারে কৃষ্ণার শৈশব অতিবাহিত হয়। তাকে ‘খাঁটি মেম’ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নাম দেওয়া হয় ক্রীষ্টিনা এবং পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয় কলকাতায়। কিন্তু আধুনিক পরিবেশ ও খ্রিস্টান আচার-আচরণ সত্ত্বেও কৃষ্ণা নিজের শিকড় ভুলতে পারে না। জমিদার বংশের বাঙালি সংস্কৃতি ও আত্মবোধ তার মধ্যে অটুট থাকে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে কৃষ্ণার জীবনসংগ্রাম আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক নীরব কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ। কৃষ্ণা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কীভাবে নারীর বঞ্চনা, পরিচয় সংকট এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে গভীর মানবিকতায় তুলে ধরেছেন এবং এই কৃষ্ণার জীবনকাহিনীতে ঔপন্যাসিক নিজের জীবনবোধ ও চেতনাকে কীভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তা সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

Discussion

১৯৩০ সালে রচিত সীতাদেবীর ‘পরভৃতিকা’ উপন্যাসে তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক নির্মম ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। ‘পরভৃতিকা’ উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই তার গভীর তাৎপর্য ও সার্থকতা নিহিত। ‘পরভৃতিকা’

শব্দের আভিধানিক অর্থ হল পরপালিত বা অন্যের দ্বারা পুষ্ট। এই শব্দটি ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নির্মম বাস্তবতাকে উন্মোচিত করেছেন। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে ভূমিষ্ঠ হওয়া একটি নবজাতক শিশুর কেবল কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করার কারণেই তাকে জন্মগত সূত্রে প্রাপ্য সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। শুধু সামাজিক অধিকারই নয়, এমনকি মাতৃত্বের স্বাভাবিক স্নেহ ও মমতাও তার জীবনে অনুপস্থিত থাকে। কন্যা সন্তান হওয়াই হয়ে ওঠে তার জীবনের প্রথম অভিষেক। সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ফলে সে জন্মলগ্ন থেকেই পরবাসিনী, নিজের ঘরে থেকেও পরের আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠে। এই বঞ্চনা ও একাকিত্বই তার জীবনের মূল সুর নির্ধারণ করে দেয়। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে এক দুঃখ-বিভাডিত নারীর জীবনসংগ্রামের কাহিনি অঙ্কন করেছেন, যে মেয়ে সমাজের অবহেলা, পরিচয়হীনতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নেয় এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। কৃষ্ণের সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগত নয়, তা আসলে সমকালীন সমাজে নারীদের অস্তিত্বের সার্বিক লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি। তবে উপন্যাসের শেষ পর্বে ঔপন্যাসিক নারীকে তার চিরাচরিত আশ্রয় অর্থাৎ সংসার ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই ফিরিয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সমকালীন সমাজবাস্তবতার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে নারীর স্বাধীনতার পথ যে তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না, সেই সত্যটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে নবাগত শিশুকন্যা কৃষ্ণ থাকলেও, তার জীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বহু পার্শ্বচরিত্র ও সামাজিক বাস্তবতা। উপন্যাসের মূল কাহিনির অন্তরালে প্রবাহিত হয়েছে কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত, কিন্তু ঔপন্যাসিক কৌশলগতভাবে উপন্যাসের সূচনা করেছেন এক রাজপুত্র দাসীর কণ্ঠস্বর দিয়ে –

“ভবানী, ও ভবানী!”^১

জমিদার পরিবারে বংশরক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। এই মানসিকতারই নির্মম শিকার হয় কৃষ্ণ। যার বেড়ে ওঠার কথা ছিল রাজপ্রাসাদে, তাকে যেতে হয় অচেনা পথে। মিসেস মিত্রের তত্ত্বাবধানে গিরিডির উশ্রী নদীর ধারে কৃষ্ণের শৈশব অতিবাহিত হয়। কৃষ্ণকে খাঁটি মেম হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তার নাম দেওয়া হয় ক্রীষ্টিনা এবং পড়াশোনার জন্য তাকে পাঠানো হয় কলকাতায়। কিন্তু আধুনিক পরিবেশ ও খ্রিস্টান আচার-আচরণ সত্ত্বেও কৃষ্ণ নিজের শিকড় ভুলতে পারে না। জমিদার বংশের বাঙালি সংস্কৃতি ও আত্মবোধ তার মধ্যে অটুট থাকে। তাইতো কৃষ্ণ মিসেস মিত্রের প্রদত্ত ক্রীষ্টিনা নাম পরিবর্তন করে নিজেই নিজের নাম রাখে কৃষ্ণ। আর এই কৃষ্ণই সতেরো-আঠারো বছর বয়সে অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে বলতে পারে যে –

“আমি গীর্জা ফির্জা যাব না, আমার ভাল লাগে না।”^২

এইরকম সাহসিকতার সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করার দৃঢ়তা কৃষ্ণ অর্জন করেছিলেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে। আমাদের মনে হয় ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনবোধের টুকরো ছবি দিয়েই যেন লিখেছেন কৃষ্ণের জীবন কাহিনি। আবার কৃষ্ণ আত্মরক্ষা করতেও জানে, কারণ সর্বদিক থেকে যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংসাররূপ সমুদ্রে সে ছিল সম্পূর্ণ একা। তার চারপাশে মানুষ ছিল, কিন্তু এমন কেউ ছিল না যে তাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে। এই ভালোবাসাহীনতা ও আশ্রয়হীনতাই কৃষ্ণকে আত্মনির্ভর হতে বাধ্য করেছে। এছাড়াও কৃষ্ণের জীবনে বিবাহ কোনো প্রধান আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠেনি। তার কাছে বিবাহ মানেই ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর নেমে আসা দুঃখের অন্ধকার ছায়া। তাই বিবাহ কৃষ্ণের স্বপ্ন নয়, তার স্বপ্ন ছিল নিজের যোগ্যতায় স্ফলারশিপ অর্জন করে আমেরিকায় গিয়ে চাকরি করা এবং স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন করা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাই তার কাছে ছিল সর্বাগ্রে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে নারীর আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তাকে বিবাহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার পক্ষপাতী নন। লাভণ্যের সঙ্গে কৃষ্ণের আলাপচারিতার মাধ্যমে এই মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে –

“প্রত্যেক মেয়ের উচিত বেড়াতে বেরবার সময় একটা চাবুক সঙ্গে রাখা, আর এরকম বাঁদরামি দেখলে আর কথাটি না ব'লে এইসব রসিক-চূড়ামণিদের আগাগোড়া চাক্কে দেওয়া। তাহ'লে এঁদের রসাধিক্য

একটু কমে বোধহয়। আমার গায়ে অবশ্য কেউ কিছু ছোঁড়েনি, কিন্তু গুটি-দুই তিন ছেলে ঠিক ক'রে নিয়েছে যে আমার একটা guard of honour দরকার। যখন যেখানে যাই, দেখি, অন্ততঃ চার গজের মধ্যে তারা কোথাও না কোথাও আছে।”^৩

স্বনির্ভরতা ও স্বচ্ছতা সীতা দেবীর নায়িকাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসের নায়িকা কৃষ্ণা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে কৃষ্ণা চাকরিকে বেছে নেয় এবং আত্মমর্যাদা বজায় রেখে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। কম বেতনের খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে কাজ করা তার পছন্দ নয়, বরং সে উচ্চবেতনের, মর্যাদাসম্পন্ন কর্মে যোগ দিতে আগ্রহী। এই লক্ষ্যেই সে লাভগ্যের কাছে একটি ভালো কাজের সন্ধান চায়। লাভগ্যের উদ্যোগে কৃষ্ণার সামনে রেঙ্গুনে কাজের সুযোগ আসে এবং সেখানে তাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৌদের ইংরেজি শিক্ষা ও গান-বাজনার তালিম দিতে হবে। তখনকার সমাজে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে বিদেশে গিয়ে উপার্জন করা একজন নারীর পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুর্লভ ও সাহসী সিদ্ধান্ত। প্রথমে কৃষ্ণার মনে কিছু দ্বিধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করে যখন তাকে আগলে রাখার কেউ নেই, তখন বিবাহ বা অন্তঃপুরবাসের মোহ ত্যাগ করাই যুক্তিসংগত। এই আত্মচেতনা থেকেই সে রেঙ্গুনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সমাজের চাপে পড়েও নারী যখন ঘরের বাইরে পা ফেলার কথা ভাবে, সেটাই এক বড় সাফল্য। যদিও সেই সময়ে নারীর চাকরি করা কিছুটা কল্পনাপ্রসূত মনে হতে পারে, তবু ঔপন্যাসিক তাঁর নায়িকাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব পারিবারিক অভিজ্ঞতা, যেখানে নারীর স্বাধীনতার পথ কিছুটা উন্মুক্ত ছিল। কৃষ্ণাকে তিনি সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়ের ছাঁচে আঁকেননি। তার আচার-আচরণে বিলিতি প্রভাব থাকলেও মানসিকভাবে সে পুরোপুরি বিলাতি হয়ে ওঠেনি। রেঙ্গুনে যাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব সে নিয়েছিল, তাদের কাছে সে মিস্ রায় নয়, কৃষ্ণা দিদি হিসেবেই সাড়া দেয়। এই পরিচয়বোধই প্রমাণ করে যে আধুনিকতার আবরণে থেকেও কৃষ্ণার মানবিকতা, স্বচ্ছতা ও বাঙালি সত্তা অটুট ছিল।

সুবীর প্রথমবার কৃষ্ণাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বক্তব্যে কৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায় -

“সাগরের জলের মত ঘন নীল রেশমের শাড়ী তাঁহার বিদ্যুৎপ্রভরূপের জ্যোতি আরো যেন বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। হাতে দুগাছি-নীল এনামেলের কাজ করা চওড়া সোনার চুড়ি, কাঁধে একটি সেই ধরণের ব্রোচ, আর কোথাও কোন অলঙ্কার নাই। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন সম্রাজ্ঞী। চালচলনের ভিতর সতেজ নির্ভীক ভাব, অথচ বিন্দুমাত্র গাঙ্গীর্যের অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না।”^৪

সুবীর কৃষ্ণার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল, তার মা ভানুমতীর প্রতিকৃতি। সেই অপূর্ব সুন্দরের অধিকারিনী আর কেউ নয় ভানুমতীর বদলে দেওয়া কন্যা কৃষ্ণা। মায়ের প্রতিকৃতি হওয়ার দরুণ কৃষ্ণার প্রতি সুবীর আরও বেশী আকৃষ্ট হয়ে পরে এবং কৃষ্ণাকে ভালো করে জানার তীব্র আগ্রহ তার মধ্যে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণার নিঃসঙ্গ জীবনে পূর্ণতা আনার জন্য প্রয়োজন ছিল ভালোবাসার। তবে কৃষ্ণার কাছে সেই ভালোবাসার আশ্রয়ই সম্মানের যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। বিপিনের ভালোবাসাকে কৃষ্ণা তাই অস্বীকার করেছে কারণ সে জানত পিতৃপরিচয় নেই এবং সকলের চোখে যে খ্রীষ্টান, সেই মেয়েকে কোনো হিন্দু পরিবার এতটা সহজে মেনে নিতে রাজী হবে না। কৃষ্ণার অহংবোধই ছিল তার কাছে সর্বাগ্রে তাই তো তড়িৎ এর মুখের সমালোচনা -

“তোর বিপিনদা নাকি খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে করেছে?”^৫

শুনে সে মানসিক আঘাত পায় এবং নিজের জন্য একটু সম্মানের স্থান খোঁজে। এই যে আত্মশ্লাঘার বোধ সে সময়ে নারীর কাছে প্রায় দুর্মূল্য ভাবা হত। কেননা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার বাইরে যে জীবন থাকতে পারে তা তো তাদের কাছে অজানা ছিল। ভালোবাসার টান সুবীরকে নিয়ে গিয়েছিল সাগরপারে সেখানে কৃষ্ণার ক্ষণকালের দেখাতেই সুবীরের মনে জেগে উঠে কৃষ্ণার প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণ কিন্তু কৃষ্ণা নিজেও এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুবীরকে নিয়ে তার

মনেও জাগে নানা প্রশ্ন। ধীরে ধীরে কোনো এক অপরিচিত বন্ধনে কৃষ্ণ জড়িয়ে পড়ে সুবীরের সঙ্গে। সুবীরের প্রেমস্বীকার এই উপন্যাসে এক গভীর মানসিক মুহূর্তের সৃষ্টি করে। কৃষ্ণর সামনে দাঁড়িয়ে সুবীর স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় -

“তাহলে কতগুলো অসম্ভব কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হন। এগুলো কোনোদিন মুখে বলব তা মনে করিনি, কিন্তু আপনি আজ আমায় বলতে বাধ্যই করছেন। শুনে বিরক্ত হবেন না, এইটুকু আমার প্রার্থনা। ব’লে আমার আর কোনো লাভ নেই, বলতে পেলাম এইটুকুই লাভ। আর্থিক কোনো লাভের প্রত্যাশায় একথা আমি বলছি না, এইটুকু সুবিচার আপনি আমার সম্বন্ধে করবেন তা জানি। আমি আপনাকে ভালোবাসি। বিশ্বাস করবেন না হয়ত, কারণ আপনার সঙ্গে আলাপ আমার অতি অল্পদিনের। শুধু চোখে দেখে ভালোবাসা যায়, এটা আগে আমিও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস না করবার উপায় নেই। রেঙ্গুনে শোয়ে ডাগন প্যাগোডায় বেড়াতে গিয়ে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম। সেদিন থেকে নিজের জীবনের সার্থকতা আমি খুঁজে পেয়েছি। ভবিষ্যতে আমার জন্যে কি আছে জানি না। কিন্তু জন্মেছিলাম ব’লে আমি কখনও দুঃখ করব না।”^৬

ভালোবাসা ও ভালোলাগার পার্থক্য বুঝে ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের নায়িকারা। তাইতো কৃষ্ণর প্রণয়প্রার্থী বিপিনকে সে ফিরিয়ে দেয়। বিপিনকে সে পছন্দ করত তার ব্যবহারের জন্য কিন্তু জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া ছিল তার পক্ষে অসম্ভব। বিপিনকে যদি সে গ্রহণ করতও তবে তাকে মর্যাদা দিতে পারত কি, হয়ত বা পারত না। এই ধরণের মুক্ত চিন্তা করার ক্ষমতা অন্তত ঔপন্যাসিক তাঁর নায়িকাদের দিয়েছিলেন। কৃষ্ণকে এতটা বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলার পেছনে ছিল ঔপন্যাসিকের নিজের প্রতিষ্ঠিত জীবন। সেই জীবনে তিনি প্রথম স্থানে রেখেছিলেন আত্মমর্যাদাকে, তাইতো কৃষ্ণকে তিনি কারো কাছে গলগ্রহ করে তুলেননি বরং নারীর আত্মিক উত্তরণের চেষ্টাই যেন ক্রমশঃ উঠে আসত তাঁর লেখার মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন -

“কৃষ্ণকে যে গ্রহণ করিবে, সে যেন সেটা সৌভাগ্য ভাবিয়াই করে, ইহাই তাহার হৃদয় দাবী করিত। দীনা ভিখারিনীর মত কোথাও অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া তাহাকে যাইতে হইবে, তাহাকে দেখিয়া কেহ ঘৃণায় নাসিকা কুণ্ঠিত করিবে, ইহা ভাবিতেই যেন তাহার মস্তিষ্কে আগুন ধরিয়া যাইত।”^৭

তবে কৃষ্ণর জীবনের মোড় ঘুরে যায় যখন সে জানতে পারে যে তার জন্ম হয়েছিল কলকাতার ল্যান্স ডাউন রোডের এক জমিদার বাড়িতে। ভানুমতীর গর্ভজাত সন্তান হিসেবেই সে পৃথিবীতে এসেছিল, কিন্তু জমিদারি রক্ষা ও বিপুল অর্থ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় সেই নিষ্পাপ নবজাতককে নিক্ষেপ করা হয় এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীবনে। পিতৃতান্ত্রিক স্বার্থের কারণে সে হারায় তার পিতৃপরিচয়, মাতৃস্নেহ ও বংশপরিচয়, তার স্থানে বসানো হয় এক অনাথ শিশুপুত্র যে আজ সুবীর নামে পরিচিত। এই সত্য উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণর অন্তর্জগতে প্রবল দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। একদিকে নিজের পরিচয় ও মাতৃমমতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনায় তার মনে জন্ম নেয় গভীর আনন্দ ও আকুলতা, অন্যদিকে সুবীরকে মাতৃহীন করে দেওয়ার যন্ত্রণা এবং তাকে হারানোর আশঙ্কা তার মনকে বিষন্ন করে তোলে। সুবীরের প্রতি তার সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বোধ তাকে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই আনন্দ ও বেদনার দ্বৈত অনুভূতির মধ্য দিয়েই কৃষ্ণর দিন কাটতে থাকে। এই দ্বন্দ্বই কৃষ্ণ চরিত্রকে আরও মানবিক ও গভীর করে তোলে এবং এই উপন্যাসে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নির্মম পরিণতি ও নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্রভাবে উন্মোচিত করে।

উপন্যাসটির শেষের দিকে লক্ষ্য করা যায় সুবীরের আন্তরিক ও নিরলস চেষ্টায় ভানুমতীর হারানো কন্যা কৃষ্ণ তার প্রকৃত আসনে ফিরে আসে এবং নিজের পরিচয়, গৌরব ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণর কাছে সুবীরের অনুরাগ কোনো গোপন বিষয় ছিল না, সে নিজেও নিজের অনুভূতিকে স্পষ্টভাবে বোঝে। তাই তাকে হারাতে কোনো দুঃখ বা যন্ত্রণার অবকাশ থাকে না। এই মিলনের ফলে ভানুমতী লাভ করেন শুধু হারানো কন্যাই নয়, একসঙ্গে পেয়েছেন জামাতা

ও পুত্রবধূর স্নেহময় সঙ্গ। উপন্যাসের এই সমাপ্তি শুধু পারিবারিক পুনর্মিলনের গল্প নয়, বরং পিতৃতান্ত্রিক ও সমাজগত বিভাজনের সেতুবন্ধনের প্রতীক।

পরিশেষে বলা যায় যে এই উপন্যাস রচনার সময়, তখনকার সমাজে মেয়েদের জন্য নিজের পছন্দের পাত্রকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং বিষয়। পুরুষতান্ত্রিক বর্ধিত নিয়ন্ত্রণ আর সামাজিক নিয়ম-কানুন মেয়েদের স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। কিন্তু সীতাদেবী তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে নারীদের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের মুক্ত ও স্বনির্ভর জীবনদানের তাগিদ দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা কেবল ভালোবাসতে জানে না, সেই ভালোবাসাকে স্বীকার করতেও সক্ষম। এই উপন্যাসের কৃষ্ণা চরিত্রে এর উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। কৃষ্ণা শুধুমাত্র সুবীরের ভালোবাসাকে গ্রহণ করেননি, বরং দ্বিধাহীনভাবে নিজের অধিকার ও পছন্দের কথা স্পষ্টত প্রকাশ করেছেন-

“যা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা কি আর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? আমার কি আপনাকে থাকতে বলবার কোন অধিকার নেই?”^৮

এই উচ্চারণ ছিল নারীর স্বায়ত্তশাসনের এক সাহসী প্রমাণ। বিশ শতকের লেখিকাদের কলমে নারী স্বাধীনতার ধারণা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু সীতাদেবীর কাজ ছিল সেই পথের প্রারম্ভিক আলোকবর্তিকা। তিনি তাঁর সাহিত্যে চরিত্রদের মাধ্যমে নারীর আত্মসম্মান, স্বাধীনতা এবং নিজের পছন্দের প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা ছড়িয়েছিলেন, যা পরবর্তী যুগের নারী আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

Reference:

১. দেবী, সীতা ‘তিনটি উপন্যাস’, সম্পাদনা - অনসূয়া গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৯, মাঘ ১৪১৫, পৃ. ১৫
২. তদেব, পৃ. ৫৩
৩. তদেব, পৃ. ৪৮
৪. তদেব, পৃ. ১২২
৫. তদেব, পৃ. ১৪৫
৬. তদেব, পৃ. ২১২
৭. তদেব, পৃ. ১৪৫
৮. তদেব, পৃ. ২১২

Bibliography:

- দে, মাধবী, শান্তাদেবী ও সীতাদেবী জীবন সাহিত্য আধুনিকতা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১০, এপ্রিল ২০০৩
ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা ‘কাহাকে’ থেকে ‘সুবর্ণলতা’, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮
চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০
ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, বিংশ শতাব্দীর নারী উপন্যাসিক, পূর্বা কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ৭ আগস্ট, ২০০৭
ভট্টাচার্য দেবীপদ, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১